সম্পাদকের সাফাই

বইতে একরকম সামুদ্রিক মাছের কথা পড়েছি। ইংরেজিতে বলে কাট্‌ল্ ফিশ। অভিধান নাড়াচাড়া করে হুবহু বাংলা প্রতিশব্দ পাই নি। তবে তাদের আচরণের বর্ণনা আছে। নিজেদের শরীরের মধ্যেই ওরা একরকম কালি উৎপাদন করে আর বেগতিক বুঝলে তা উগরে আশেপাশে তৈরি করে গাঢ় অন্ধকার। তারই আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন। মানবেতর প্রাণীজগতে স্বার্থসিদ্ধি বলতে অবশ্য মূলতই আত্মরক্ষা।

মানব-ইতিহাসেও অনুরূপ আচরণের নজির আছে। অন্ধকার উগরে স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন। তবে মানব-ইতিহাস বলেই ব্যাপারটা তুলনায় জটিল। সব মানুষের অবস্থা সমান নয়। খুব মোটা কথায় মানব-সমাজ দুভাগে বিভক্ত : শাসক শ্রেণী আর শাসিত শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীটির পক্ষে এ-হেন আচরণের তাগিদও নেই, নজিরও নেই। তাগিদটা প্রথম শ্রেণীটির মধ্যেই প্রবল। দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে তাঁবে রাখবার কায়দা। এভাবে তাঁবে রাখার উপরই প্রথম শ্রেণীটির পক্ষে আত্মরক্ষা সম্ভব। এই আত্মরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধি মানুষের বেলায় সমানার্থক। কায়দাটা কিন্তু একই। অন্ধকার উগরে তার আড়ালে আত্মরক্ষা।

কিসের অন্ধকার? তার মূল উপাদান বলতে অলীক বিশ্বাস। শাসক-সম্মত সংগঠিত সংস্কার। নরকের আতঙ্ক, স্বর্গের আকর্ষণ।

কথাগুলো আসলে নতুন নয়। সমাজ-শাসনের পক্ষে এ-হেন অন্ধকারের উপযোগিতা প্রাচীন কাল থেকেই—এমন কি মহামতি দার্শনিকদের মধ্যেও স্বীকৃত। খুবই প্রকট দৃষ্টান্ত যদি দেখতে চান তাহলে প্রাচীন গ্রীসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। প্লেটো-র রচনা। সমাজ-আদর্শ বলতে তাঁর কাছে মোদ্দা কথায় দাস-প্রথা। সে সমাজে কায়িক শ্রমের পুরো দায়িত্বটা ক্রীতদাসের ঘাড়ে। তাদেরই উপর খাদ্য-বস্ত্র-ইমারত আদি সবকিছু তৈরির পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ও বিলাসভোগী মানুষের আহার-বিহার থেকে শুরু করে এমনকি চিন্তাবিলাসের আয়োজন। প্লেটোর দার্শনিক প্রতিভায় সংশয় প্রকাশ অবশ্যই অশিক্ষিতের পরিচয় হবে। তাঁর বাস্তববোধের প্রসঙ্গে ও একই কথা। তিনি অবশ্যই জানতেন এ হেন আদর্শ সমাজের সংরক্ষণে পাইক-পেয়াদার অনিবার্য প্রয়োজন। কিন্তু মেধা তাঁর এমনই প্রবল যে, তিনি আরও বুঝেছিলেন : শুধুমাত্র পাইক-পেয়াদাই পর্যাপ্ত নয়। আরও প্রয়োজন সুচিন্তিত মিথ্যা কথার। মিথ্যা হলেও তা প্লেটোর মতে মঙ্গলময়। তাঁর ভাষায় *beneficial falsehood* — শ্রেয়-র খাতিরে মিথ্যা। এ-হেন মিথ্যার বোকায় ধারণ মানুষের মনকে কুঁজো করে রাখতে পারলে দাস-সমাজের নিরাপত্তা। অর্থাৎ যে কথা থেকে শুরু করেছিলাম, মোটের ওপর তাই-ই। অন্ধকারের আড়ালে শাসক শ্রেণীর পক্ষে আত্মরক্ষার—বা স্বার্থরক্ষার—আয়োজন।

প্লেটো-র সর্বশেষ রচনার নাম *The Laws*, অর্থাৎ 'আইন-প্রসঙ্গে'। এই গ্রন্থে তিনি প্রায় মুগ্ধ নয়নে প্রাচীন মিশরের দিকে ফিরে দেখতে বলছেন। মুগ্ধ, কেননা তিনি বলছেন, প্রাচীন মিশরে এ হেন অন্ধকার সৃষ্টির কী বিপুল আয়োজন! ভিত্তিহীন বিশ্বাস—বা অন্ধ

সংস্কার—সাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কী দক্ষ কৌশল! কৌশলটা আমাদের আধুনিক ভাষায় প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার! গ্রীক সমাজে যদি তা সার্থক হতো তাহলে আইনকারের সমস্যা সত্যিই কত সহজ ও নিরাপদ হতে পারত!

কিন্তু গ্রীক সমাজে একটা বাধা ছিল। ওদেশের আদিবিদ্বানেরা—প্রথম দার্শনিককেরা—এমন কথা প্রচার করে এমন এক চিন্তাপ্রবণতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে গেছেন যেখানে প্রশ্রয় পায় বিজ্ঞান-চেতনা। 'সোফিস্ট' (*Sophist*) বলে গ্রন্থে তিনি এই আদি-বিদ্বানদের নির্বুদ্ধিতায় স্তম্ভিত হয়ে, মঙ্গলময় মিথ্যা বনাম বৈজ্ঞানিক চেতনার দ্বন্দ্বকে দেব-অসুরের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেবতারা প্রথমটির প্রচারক, অসুরেরা দ্বিতীয়টির। নতুন করে বাংলা তর্জমা করা সহজসাধ্য নয়; বক্তব্যের ধার অল্পবিস্তর ভোঁতা হবার ভয়। তাই প্রামাণিক ইংরেজি তর্জমা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করব (পরে তার ভাবার্থটুকু দেব) :

– Why, this dispute about reality is a sort of battle of Gods and Giants. One side drags everything down to earth, literally laying hands on rocks and trees, arguing that only what can be felt and touched is real, defining reality as body, and if anyone says that something without body is real, they treat him with contempt, and will not listen to another word.

– Yes, they are clever fellows; I have met a lot of them.

– So their opponents in the heights of the unseen defend their position with great skill, maintaining forcibly that true existence consists in certain intelligible, incorporeal forms, describing the so-called truth of the others as a mere flowing part of becoming, not reality at all, and smashing their so-called bodies to pieces. On this issue there is a terrific battle always going on.

[— বস্তুজগৎ নিয়ে এই তর্কটা এক ধরনের দেব-অসুরের যুদ্ধ। এক পক্ষ (অসুরপক্ষ) সব কিছুকেই পৃথিবীতে টেনে নামিয়ে আনে, সত্যিসত্যিই পাথর ও গাছপালায় হাত রাখে; তাদের যুক্তি এই যে, যা কিছু অনুভব করা যায় ও ছোঁয়া যায় তা-ই বাস্তব। বাস্তবতাকে তারা দেহ বলে সনাক্ত করে, আর কেউ যদি বলে, দেহ ছাড়া অন্য কিছুও বাস্তব, তারা তাকে খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার কোনো কথায় আর কান দেয় না।

—হ্যাঁ, তারা খুব সেয়ানা লোক, ওরকম বিস্তর লোক আমার দেখা আছে।

—তাই তাদের বিরোধীপক্ষ (দেবপক্ষ) অদৃশ্য জগতের চূড়া থেকে তাদের অবস্থানের সপক্ষে কথা বলে খুবই দক্ষভাবে। তারা জোর দিয়ে দাবি করে, সত্যিকারের অস্তিত্ব হলো কতক বোধ্য, অদেহী রূপ মাত্র; অন্যরা যাকে সত্য বলে সেই তথাকথিত সত্য হলো, তাদের মতে, হয়ে-চলার এক বহমান অংশ মাত্র, তা আদৌ বাস্তব নয়। তাদের প্রতিপক্ষের (অসুরপক্ষের) তথাকথিত দেহকে তারা ভেঙে খানখান করে দেয়। এই নিয়ে সর্বদাই এক প্রচণ্ড লড়াই চলছে।]

এই হলো প্লেটোর মতে দেবাসুরের সংগ্রাম। আমাদের পরিভাষায় প্রতিবিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের সংগ্রাম। অন্ধকার বনাম আলোর সংগ্রাম। এবং এই আলোচনার জের টেনেই 'আইন প্রসঙ্গে' (*The Laws*) গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন, আলোক পন্থীদের কথা সমাজ-শাসনের পক্ষে কী ভয়ংকর সর্বনাশের আয়োজন সৃষ্টি করে। প্রামাণিক ইংরেজি তর্জমা থেকে আবার কিছুটা উদ্ধৃতির অনুমতি দিন (পরে ভাবার্থটুকু দেওয়া আছে) :

– The Gods, my friend, according to these people, have no existence in nature but only in art, being a product of Laws which differ from place to place according to the conventions of the lawgivers; and natural goodness is different from what is good by law... This is what our young people hear;... they fall into sin, believing that the gods are not what the laws bid them imagine to be, and into civil strife, being induced to live according to nature, that is by exercising actual domination over others instead of living in legal subjection to them.

– What a dreadful story and what an outrage to the public and private morals of the young!

[—শোনো বন্ধু, এই সব লোকের মতে, প্রকৃতিতে দেবতাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু শিল্পে। তাঁরা (দেবতারা) আইন মোতাবেক তৈরি হয়েছেন। আইনকারদের প্রথা অনুযায়ী দেশে-দেশে আইনের মধ্যে ফারাক থাকে; আর প্রকৃতিগতভাবে যা ভালো ও আইনের মতে যা ভালো—এ দু-এর মধ্যেও তফাত থাকে ... আমাদের তরুণদের কানে এ কথা ঢুকছে; ... তারা ডুবছে পাপে, বিশ্বাস করছে যে, আইন তাদের যেমন কল্পনা করতে বলে দেবতারা তেমন নন। আর তারা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, কারণ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বাঁচতে শেখানো হচ্ছে, অর্থাৎ অন্যদের কাছে আইনের বশ্যতা না মেনে তারা অন্যদের ওপর সত্যিকারের প্রভুত্ব কায়েম করে বাঁচতে শিখছে।

—কী ভয়ংকর কথা! তরুণদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নীতিবোধের ওপর কী প্রচণ্ড অত্যাচার!]

পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। অমন প্রাঞ্জল স্পষ্ট ভাষায় মূল কথাটা বলার নজির বিশ্বসাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। কোথাও এতটুকু রাখঢাকের প্রয়াস নেই। যত নষ্টের গোড়া বলতে এই মাটির পৃথিবীটার প্রতি টান এবং তারই ব্যাখ্যায় নিছক স্বাভাবিক নিয়মের অনুসরণ! ফলে দেহাতীতের সন্ধানটা নস্যাৎ করার আয়োজন, আয়োজন পরলোকে বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করার।

সবচেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার বলতে আইনকারেরা যে-দেবলোকে বিশ্বাসকে অমোঘ বলে মানবার নির্দেশ দিয়েছেন তা যেন একটা পরিহাসের ব্যাপার করে তোলার প্রয়াস। তরুণদের মাথায় এ হেন সব কথা ঢুকলে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাই যে রসাতলে যাবার উপক্রম হবে। মানুষগুলো শাসক সম্প্রদায়ের কাছে জোড় হাতে হেঁট মাথায় অবনত হয়ে থাকার বদলে মাথা তুলতে শুরু করবে; এমনকি শাসকশ্রেণীরই উচ্ছেদের আয়োজন করবে!

সমাজ-শাসনের পক্ষে বিজ্ঞানের প্রয়াসকে একেবারে বরবাদ করে অন্ধকারের উপযোগিতা ঘোষণা করার এমন নির্ভীক ঘোষণা আর কোথাও পড়ি নি।

অন্যেরাও মূলত একই অভিপ্রায়ে অন্ধ বিশ্বাসের সমর্থনে একই কথা বলেছেন। বিদেশে এবং আমাদের দেশেও। কিন্তু কোথায় প্লেটোর মতো অমন প্রতিভা, অমন নির্ভেজাল যুক্তির পরিচয়?

আমাদের দেশের শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রকারদের উমেদারদের মন্তব্য পড়েছি। অন্ধকারের হাতিয়ার দিয়ে মানুষগুলোকে তাঁবে রেখে যে-সব অতি-অমানুষিক বিধান তা পড়তে পড়তে শিউরে উঠেছি। উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে কি? শূদ্রকুলে যাঁদের জন্ম তাদের দাবিয়ে রাখার উৎসাহ পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হতে হয়; বিজ্ঞানমাত্রের বিরুদ্ধে বিধানগুলোর খাতিরে এমনকি হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার

বিরুদ্ধে কতই না খুঁশিয়ারি! কিন্তু তুলনায় প্রকাশভঙ্গিটা নেহাতই স্থূল। প্রধানতই নরকবাসের কল্পিত যন্ত্রণার কর্কনা! দেব-দ্বিজে ভক্তির ফলে স্বর্গে কল্পিত সুখভোগের আকর্ষণে মানুষকে ভুলিয়ে রাখবার প্রয়াস।

এসব কথাকে নেহাতই মান্ধাতার আমলের ব্যাপার বলে উপেক্ষা করারও কোনো সুযোগ নেই। শাস্ত্রবচনের যাঁরা উমেদার তাঁরা বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সরাসরি নেমে পড়েছেন। রক্তগঙ্গা বওয়ার যে ডাক তাতে সারা দেশটাই আতঙ্কিত : সকালে খবরের কাগজের দিকে হাত বাড়াবার সময় হাত কাঁপে, বেতার আর দূরদর্শনের খবর কানে ঢুকলে বুক হিম হয়ে যাবার উপক্রম।

কিন্তু—

ও আমার সোনার বাংলা! এই বঙ্গভূমিতেও অন্ধকারের তাণ্ডব বড় কম নয়, কম নয় অন্ধকারের দোহাই দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্যাতনের নির্মম আয়োজন। তবুও আমার বাংলা সত্যিই সোনার বাংলা। অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বঙ্গমনীষার ইতিহাসে একের পর এক মানুষের আবির্ভাব; তাঁদের যে-অভিযান তা যেমনই দুঃসাহসিক তেমনি প্রখর প্রতিভার পরিচায়ক। রামমোহন রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখুন। বুকের বল ফেরত পাবেন। এই সব দীপ্ত মেধাবীরা কিন্তু প্লেটো-র ঐ অসুরদের দলে পড়েন। ধর্মান্ধতার উর্ণজাল ছিন্নভিন্ন করে, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল জ্বেলে, যুক্তিনিষ্ঠ নির্মল চিন্তার হাতিয়ার হাতে বিজ্ঞানের সমর্থনে এঁরা এগিয়ে এসেছেন। নাস্তিক বলে অপবাদে তোয়াক্কা করেন নি। একজন নন; দুজন নন; একের পর এক এ হেন মনীষার আবির্ভাব। এঁদের কথা মনে রাখলে বঙ্গভাণ্ডারে বিবিধ রতনের কথাটা অতিরঞ্জন হবে না। তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযান থেকে আমাদের আজকের দায়িত্ব নতুন করে মনে পড়বে। অন্ধকারের আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে থাকার বদলে তাঁরা আমাদের এক বিরাট দায়িত্বের ভার দিয়ে গিয়েছেন। সে দায়িত্ব বলতে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকা। হয়তো মার আসবে; মার খেতে হবে; কিন্তু তারই ভয়ে নেতিয়ে পড়া মানে আরও বেশি মারের মুখে পড়া।

তাঁদের এই প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হবার দিন এসেছে। সময় কম। তাই আজকেই। এখুনিই। কেননা আর এইসব রচনার চর্চা নিছক বিদ্যাবিলাস নয়। বাঁচা-মরার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

যদি বাঁচতে চাই, যদি আমাদের সন্তানদের জন্যে রেখে যেতে চাই এক সুস্থ সমাজ, তাহলে সাড়া দিতেই হবে তাঁদের আহ্বানে।

তাই এই বই। এই বই স্মরণ করিয়ে দেবে আমাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারের কথা।

ভাবতে সাহস পাই, অনেকেই সে দায়িত্বের কথা স্মরণ করতে এগিয়ে আসছেন। বইটির প্রকাশনায় যাঁদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া গিয়েছে তাঁরা এই গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সকলের হয়ে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়